বাঁশের ধারে
হলুদ দিলে
খনা বলে
দ্বিগুণ ফলে

চাষের কথা

হলুদের কণা
আদার ফনা

বর্ষ ১৬ ।। সংখ্যা ৬ ।। নভেম্বর -ডিসেম্বর ২০১৩ ।। ১৫ কার্তিক-১৪ পৌষ ১৪২০

কৃষি কথা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

কৃষি মানে চাষ। শস্য চাষ। বীজ বুনে, সেচ দিয়ে, সার দিয়ে শস্য ফলানো। শস্য চাষ। কৃষি মানে বীজ, কৃষি মানে সেচ, কৃষি মানে সার।

কৃষি মানে বীজ। বীজ বলতে প্রকৃতি। প্রকৃতি বীজ দিয়েছে কৃষককে। কৃষক বীজ সংগ্রহ করে প্রকৃতি থেকে। সংগ্রহ করেছে, নির্বাচন করেছে, কোন বীজ উপযুক্ত। নির্বাচন হয়ছে প্রজন্ম ধরে। বীজ-এর পরম্পরা আছে, ধারাবাহিকতা আছে, 'ঐতিহ্য আছে। বীজ নির্বাচনে কৃষকের জ্ঞান, বীজ জ্ঞান, পরম্পরাগত, ধারাবাহিক প্রয়োগিত, ঐতিহ্য সম্পন্ন বীজ জ্ঞান। প্রকৃতির বৈচিত্র আছে, ভৌগলিক বৈচিত্র, তাপমাত্রা, জলবায়ু, মাটির গুণ অনুযায়ী বৈচিত্র। প্রাকৃতিক বৈচিত্রতায় বীজ বৈচিত্র। আঞ্চলিক, স্থানিক বীজ বৈচিত্র। বীজ বৈচিত্রতায় শস্য বৈচিত্র্য। কৃষি মানে বিচিত্র বীজ, বিচিত্র শস্য, বিচিত্র জ্ঞান, বিচিত্র চাষ পদ্ধতি। বীজ মানে কৃষকের সংগৃহীত, নির্বাচিত বীজ। দেশজ বীজ, স্থানীয় বীজ, বীজ ভাণ্ডারের বীজ, লৌকিক বীজ, বীজের স্বদেশ।

কৃষি মানে সেচ। সেচ বলতে জলসেচ। সেচের জল ধরলে নদীর জল, খালের জল, জলাশয়ের জল, মাটির ওপরে জমে থাকা জল, বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল জমে জলাশয়ের জল। জলাশয় থেকে জল সেচে নিয়ে খেতে দিয়ে দেওয়া সেচ। বৃষ্টি নির্ভর সেচ। সেচ-প্রকল্প নির্ভর। নদী, নদী থেকে খাল, খাল থেকে জলাশয়, জলাশয় থেকে জমি। সেচ প্রকল্প সরকারি উদ্যোগ নির্ভর। সরকার দেখলে ভালো সেচ ব্যবস্থা। সরকার না দেখলে খারাপ সেচ ব্যবস্থা। ভালো সেচ ব্যবস্থায় ভালো চাষ। খারাপ সেচ ব্যবস্থায় চাষ খারাপ। সেচ ব্যবস্থা গণ উদ্যোগেও। গণ উদ্যোগ, স্থানীয় উদ্যোগ, লৌকিক 'জ্ঞান উদ্যোগ, স্বেচ্ছা উদ্যোগ। কৃষি মানে সার। বীজ অনুযায়ী শস্য। শস্য অনুযায়ী সার। সার প্রাকৃতিক। সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া। সার স্থানীয় লৌকিক 'জ্ঞান ভিত্তিক। সার শস্য মাফিক। শস্যের স্বাভাবিক উৎপাদন পরিমাণ মাফিক। সার মাটির গুণ অনুযায়ী। মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা কেন্দ্রিক।

কৃষি মানে শস্য। নানাবিধ শস্য। চাষ করে পাওয়া শস্য। চাষ না করে প্রকৃতি প্রদত্ত, প্রকৃতি সঞ্চিত, প্রকৃতি উৎপাদিত শস্য। বিস্তৃত জীব বৈচিত্র। বিস্তৃত জীব বৈচিত্রে বিস্তৃত শস্য ভাণ্ডার। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন গুণের, ভিন্ন প্রয়োজনের, ভিন্ন ঋতুর, ভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন প্রকৃতিক পরিস্থিতির ভিন্ন শস্য। মানব শস্য। প্রাণী শস্য। স্থানীয় মানব গোষ্ঠীর চাহিদা ভিত্তিক শস্য। আঞ্চলিক অধিবাসীদের প্রয়োজন নির্ভর শস্য। স্থানীয় শস্য নির্ভরতা অধিবাসীদের প্রয়োজন। আঞ্চলিক শস্য নির্ধারিত খাদ্যাভ্যাস। খাদ্যাভ্যাস ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক। কৃষি 'ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক।

কৃষি ঐতিহাসিক। কৃষি ইতিহাস, চাষ ইতিহাস, শস্য ইতিহাস। ইতিহাসে ধারবাহিকতা, ইতিহাসে দিক পরিবর্তন। ইতিহাসের নানা উপাদান। ইতিহাসের উপাদান কৃষক। কৃষক আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ। কৃষকের দাবি। ছোট কৃষকের দাবি। দাবির স্বীকৃতি। ভূমি সংস্কার নীতি। ভূমিহীন কৃষকের ভূমির অধিকার। ভূমি বন্টন। ছোট কৃষকের ভূমি মালিকানা। কৃষি মানে কৃষক। ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক বড় কৃষক। বর্গা চাষি ভূমিহীন খেত মজুর। ছোট কৃষক প্রধানত খাদ্যশস্য চাষ করে। নিজের খাবার চাহিদা থাকে, চাহিদা মেটায়, উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজারে পাঠায়, মাঝারি কৃষক স্থানীয় প্রয়োজন, স্থানীয় চাহিদা ভিত্তির খাদ্যশস্য চাষ করে, অ-খাদ্যশস্যও চাষ করে, অ-খাদ্যশস্যের আরেক নাম বাণিজ্যিক শস্য। বড় কৃষক দেখা গেছে বাণিজ্যিক শস্যে বেশি গুরুত্ব দেয়। যত বেশি ছোট চাষি তত বেশি খাদ্যশস্য। ছোট চাষির চাষ উৎপাদন দক্ষ চাষ। নিজের জমি

কার্টুন- বিক্রম নন্দওয়ানি

সম্পাদকীয়

গভীর সংকট কৃষি। চাষি জমিহারা। বিশ্বের তাবড় মাতব্বরদের ফরমান কৃষিকাজে লোক কমাও। কারণ কৃষিকে শিল্পে পরিণত করতে হবে। চাষি নয়, চাষে বহুজাতিকের প্রবেশ অবাধ করতে হবে। সরকারও ছুটছে এই ধারণার পেছনে। উত্তরভারতে সবুজ বিপ্লব মুখ থুবড়ে পড়লেও পূর্বভারতে এখন এই বিপ্লবের তোড়জোড়।

শুধু 'পুরনো' সবুজ বিপ্লবের ধারণা নয় —— এর সাথে আসছে জিন পরিবর্তিত কোম্পানির বীজ। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চাষ। বিরোধ তাই দানা বাঁধছে। চাষিরাই বিরোধিতা করছে সারাদেশে, এ রাজ্যে। তাদের দাবি কিষাণ স্বরাজ। চাষিদের স্বরাজ। এদের সাথে এবার আপনার সামিল হওয়ার পালা।

সম্পাদক

নভেম্বর -ডিসেম্বর ২০১৩

নিজে চাষ করায় যত্নাআত্তি বেশি হয়। উৎপাদন তুলনামূলক বেশি হয়। ছোট চাষ ব্যক্তি চাষ, পারিবারিক চাষ। মধ্যচাষি, বড় চাষির চাষ খেত মজুর ভিত্তিক চাষ। বড় চাষের জোতে মজুর দিয়ে চাষ, মজুরের বদলে যন্ত্র দিয়ে চাষ। চাষের যন্ত্রে মজুর উচ্ছেদ।

কৃষিতে কৃষি পদ্ধতি, চাষ প্রক্রিয়া, চাষ জ্ঞান। কৃষি জ্ঞান কৃষকের জ্ঞান, পারিবারিক জ্ঞান, গোষ্ঠী জ্ঞান, লৌকিক 'জ্ঞান, পরম্পরাগত নির্ধারিত জ্ঞান। আবার কৃষি পদ্ধতি সরকার নির্ধারিত, সরকার প্রদত্ত পদ্ধতি। সরকারি বিশেষজ্ঞ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি গবেষণাগার নির্ধারিত।

কৃষির অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতি। কৃষি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, উপকরণ, শ্রম, উৎপাদন, বিক্রি বাজার, মজুত, দাম, ক্রেতা মুনাফা। কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদক কৃষক, বিক্রেতা কৃষক, ঋণদাতা সরকারি সংস্থা, ঋণদাতা বেসরকারি মহাজন, ঋণের সুদ, ঋণের বন্দকী, ক্রেতা পাইকার, ক্রেতা আড়ৎদার, মজুতদার, শস্য ক্রেতা ব্যবসায়ী, কেনা বেচার হাট, বাজার, মান্ডি দামে শস্য ক্রেতার আধিপত্য। শস্য বাজারের দামে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, কৃষকের বিক্রিতে সরকারে সহায়ক মূল্য। সরকারের শস্য কেনা। সরকারের ব্যর্থতা।

চাষ থেকে খাদ্য শস্য। খাদ্য শস্যের চাহিদা। চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য শস্যের জোগান। খাদ্য শস্যের চাহিদা জোগান ভারসাম্য। খাদ্য নিরাপত্তা। অথবা খাদ্যাভাব। অনাহার।

কৃষির জন্য সরকারের কৃষি দফতর, সেচ দফতর, খাদ্য দফতর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বীজ ভাণ্ডার, বীজ সংরক্ষণাগার, কৃষিশস্য বাজার, সরকারি কৃষিঋণ ব্যবস্থা। ভূমি দফতর। ভূমি বন্টন। খাদ্যশস্য বন্টন, গণ বন্টন ব্যবস্থা, রেশন দোকান। কৃষি মূল্য নিয়ন্ত্রণ দফতর, শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা। সরকারের ব্যর্থতা। সরকারের দায়িত্ব পালন না করা।

কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার নাম সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লব মানে কৃষি উৎপাদনে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক, কৃষি যন্ত্র ব্যবহার, বড় চাষ বড় চাষির চাষ। সবুজ বিপ্লবে প্রথমে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি। তারপর বৃদ্ধি না হয়ে একইরকম থাকা, তারপর বৃদ্ধির হার কমতে থাকা। কৃষিতে সবুজ বিপ্লব মানে কৃষির উৎপাদন ব্যয় বাড়তে থাকা, কৃষি খরচবহুল হয়ে ওঠা। খরচ সামলাতে না পেরে ছোট কৃষকের চাষ থেকে সরে আসা। নিজের জমি 'সমর্থ' কৃষককে হস্তান্তর করে

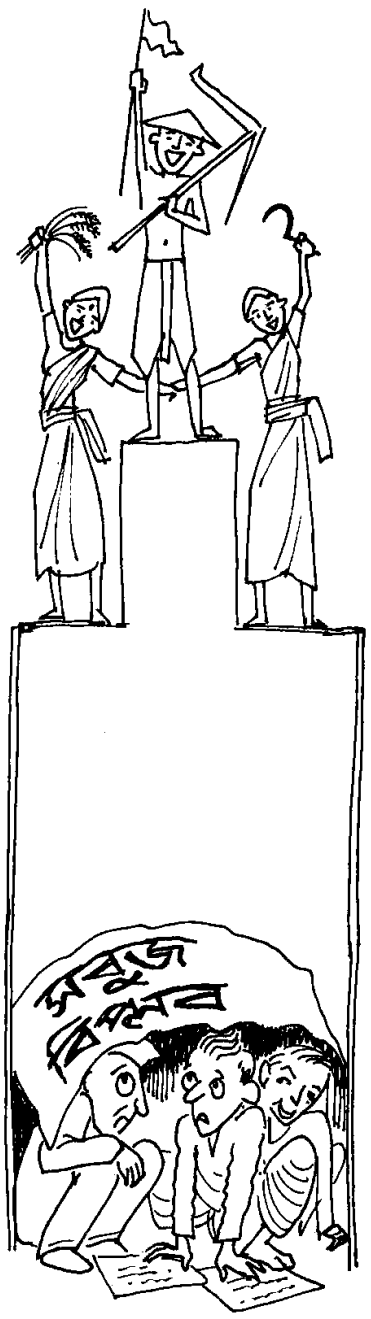

নিজে খেতমজুর হয়ে যাওয়া। ভূমি সংস্কার নীতির মধ্যে দিয়ে ভূমিহীন কৃষকের ভূমি পাওয়ার ব্যবস্থাপনার উল্টো পথে হাঁটা। ভূমি মালিক কৃষককে খেতমজুর বানিয়ে দেওয়া। সবুজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দেশের কৃষিকে দুটি মাত্র খাদ্য শস্যে আটকে ফেলা ধান আর গম। সারা দেশের খাদ্য অভ্যাসকে দুটি খাদ্যশস্যে বেঁধে ফেলা। এই দুটি শস্যের অভাব মানেই খাদ্যের অভাব। সবুজ বিপ্লব মানে দেশের শস্য বৈচিত্র্যকে, খাদ্য বৈচিত্রকে অস্বীকার করা। দেশের শস্য বৈচিত্রকে, খাদ্য বৈচিত্র্যকে হারিয়ে ফেলা। সবুজ বিপ্লবের চাষে অনেক জল লাগা। মাটির উপরের জল শেষ করে মাটির নিচের জলে হাত দেওয়া। নিচের জল তুলে নেওয়া, ডিপ টিউবয়েল, জল তোলার খরচ বেড়ে যাওয়া। ক্ষমতাবানদের জল তোলার ওপর অধিপত্য। জমিদারের মত 'জলদার'। জলদারকে জলের দাম দেওয়া। ছোটচাষির চাষ করতে না পারা। মাটির তলার জল তুলে তুলে জল শেষ। মাটি শক্ত হয়ে যাওয়া। চারপাশ রুক্ষ হয়ে যাওয়া। তৃণগুল্ম ছোটগাছ না হওয়া। গবাদি পশুর খাবার না পাওয়া। গ্রামে গবাদি পশু কমে যাওয়া। জল তুলে তুলে এমন স্তরে পৌঁছে যাওয়া যেখান থেকে জলে মিশছে

দূষিত রাসায়নিক উপাদান। মিশে পানীয় জল দূষিত, জলপান করে স্বাস্থ্য হানি। সরকারের অবজ্ঞা।

সবুজ বিপ্লব চাষ পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার। রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতার ক্ষতি। মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারে

চাষির শরীরের ক্ষতি, ফসলের খাদ্যগুণের ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি, জলের ক্ষতি। নতুন নতুন কীটের আমদানিতে আরো ক্ষতিকারক কীটনাশকের ব্যবহার। খরচ বাড়ছে। ক্ষতি বাড়ছে। সরকার নীরব।

ভারতে সবুজ বিপ্লবের আমদানি বিদেশি পুঁজির স্বার্থে, রাসায়নিক সার কোম্পানি, রাসায়নিক কীটনাশক, কোম্পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি কোম্পানির স্বার্থে। সবুজ বিপ্লবে উচ্চফলনশীল বীজ। এই বীজের ধান চাষে ধানের শিষ ছোট। ধানগাছ ছোট। ধানের খড় ছোট। ছোট খড় দিয়ে গ্রামের ঘরের চাল ছাওয়া যাবে না। খড়ের জোর কম, পলকা, ঘরের চালে দেওয়া যাবে না। চাল ছাওয়ার খড় নেই। চালে টিন। টিনের চালে ঘর গরম। গরম ঘরে স্বাস্থ্যের ক্ষতি।

উচ্চফলনশীল ধানে রাসায়নিক কীটনাশক। ধানের খড় দূষিত। দূষিত খড় গবাদি পশুর খাদ্য নয়। গবাদি পশুর ঘরের খাবারে টান। গবাদি পশুর জন্য বাইরের বানানো খাবার, কোম্পানির বানানো খাবার, খাবারের দাম বেশি, গবাদি পশু পালনের খরচ বেড়ে যাওয়া। রাসায়নিক কীটনাশক চাষের জমির জলে মিশে জল দূষিত করা। চাষের জমির জলে মাছ হওয়া, চাষে সাহায্যকারী পোকামাকড় হওয়া - বন্ধ হয়ে যাওয়া, গ্রামে সহজে পাওয়া পুষ্টিকর খাবার কমে যাওয়া, সাহায্যকারী পোকামাকড় না থাকায় চাষের ক্ষতি হওয়া। ক্ষতিকর দূষিত জল চুইয়ে চুইয়ে পাশের জলাশয়ে মিশে জলাশয়ের জল দূষিত করে দেওয়া। গ্রামের অধিবাসীদের ব্যবহারের জল দূষিত হয়ে যাওয়া। জল সংকট। শস্যে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারে শস্য দূষিত। শস্য চাষে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারে চাষির শরীরের ক্ষতি। সরকারের চোখ বুজে থাকা।

দেশের চাষ সবুজ বিপ্লব বাইরের পরামর্শে। বাইরের দেশের সরকারের, বাইরের ঋণদাতা সংস্থাদের, বাইরের কৃষি সংস্থাদের পরামর্শে, স্বার্থে। স্বার্থ বাইরের বীজ কোম্পানিদের, সার কোম্পানিদের, কীটনাশক কোম্পানিদের, কৃষি যন্ত্রপাতি কোম্পানিদের। বাইরের লাভে ভিতরের ক্ষতি। বাইরের বীজ কোম্পানিদের স্বার্থে সরকারের বীজ আইন বানানো। বলে দেওয়া চাষির নিজের বীজ অদক্ষ, তাই উৎপাদন বেশি হবে না। চাষির হাত থেকে তার বীজ কেড়ে নিলে, তাদের চাষ নিয়ে জ্ঞান, চাষিদের লোকজ্ঞান, গোষ্ঠী জ্ঞান, পরম্পরা জ্ঞানকে সরিয়ে দেওয়া হবে। চাষির স্বনির্ভরতা নষ্ট করে দেওয়া যাবে। পরাধীন চাষিকে কোম্পানির বীজ নির্ভর করে তোলা যাবে। পরের বীজ নিয়ে চাষির কোনো জ্ঞান নেই। বীজের ওপর পরনির্ভরতা মানে, চাষ উপকরণের ওপর পরনির্ভরতা, সার, কীটনাশক, জল, পরিমাণ, সময়, ক্ষতি, ক্ষতিপূরণ, সফলতা, ব্যর্থতা, গুণ, দোষ, সব মিলিয়ে পরাধীনতা। পরাধীন চাষির চাষের ব্যর্থতায় আত্মহত্যা, জমিহারা, চাষহারা। চাষির ক্ষতি বীজ কোম্পানির লাভ। বীজ আইনে লিখে রাখা আছে, চাষি তার নিজের বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়ে কাগজপত্র তৈরি রাখবে। সরকারের বীজ পরীক্ষক যাবে। চাষি যদি কাগজপত্র না দেখাতে পারে তাহলে চাষির শাস্তি। জামিন অযোগ্য অপরাধ। নিজের বীজ নিজের কাছে রাখা অপরাধ। কোম্পানির বীজ রাখলে মুক্তি। প্রথম সবুজ বিপ্লবের পর 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'। প্রথম সবুজ বিপ্লবে চাষির উপকরণ, চাষির জ্ঞান সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে চাষিকেই সরিয়ে দেওয়া। সরকারে নতুন কৃষিনীতি যাকে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' বলা হচ্ছে, যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে তিন ধরনের চাষে, কোম্পানি ফার্মিং, কর্পোরেট ফার্মিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে নতুন জমি 'অধিগ্রহণ আইন'। কোনো কোম্পানি জমি চাইলে জমি দিয়ে দেওয়া হবে। চাষির জমি সরকার দিয়ে দেবে। চাষির কাছ থেকে কেড়ে নেবে। আর জমির মালিকানার যে ঊর্ধ্বসীমা ছিল তা তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে দাঁড়ালো এইরকম, একটা কোম্পানি, চাষ করতে চাওয়া কোম্পানি, চাইলেই সরকার তাকে চাষের জমি, চাষির জমি দিয়ে দেবে, যতটা পরিমাণ দিয়ে দেবে। চাষের জমিতে কোম্পানির চাষ। আর এক রকম চাষ হবে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, চুক্তি চাষ। শস্য কোম্পানির সঙ্গে চাষির চুক্তি। শস্য কোম্পানি, শস্য কিনতে চাওয়া কোম্পানি, শস্য ব্যাবসা করতে চাওয়া কোম্পানি চাষির সঙ্গে চুক্তি করবে। চুক্তি হবে এই রকম, শস্য কোম্পানি চাষিকে বলবে তারা শস্য কিনতে চায়, তারা যা কিনতে চায় চাষি সেই শস্য বানাবে, তারা যে ধরনের শস্য কিনতে চায় চাষিকে সেই ধরনের শস্য বানাতে হবে। এই 'ধরন'এর জন্য কোম্পানি দেবে বীজ, রাসায়নিক উপাদান। চাষির নিজের উপাদান বাদ। কোম্পানির দেওয়া উপাদানের সঙ্গে কোম্পানির দেওয়া চাষ জ্ঞান। চাষির নিজের জ্ঞান নয়। শস্যের দাম কোম্পানি ঠিক করে দেবে। দাম আগাম দেবে। চাষি পুরোপুরি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল। চাষি পরাধীন। চাষির নিজের জমিতে অন্যের ঠিক করে দেওয়া শস্য, অন্যের দেওয়া উপকরণ, অন্যের দেওয়া জ্ঞানে চাষ। চাষির নিজের জমি থেকে নিজের খাদ্যশস্য বাদ। গ্রামের, জেলার খাদ্য শস্য বাদ, খাদ্য শস্যই বাদ। খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমল। খাদ্যশস্যের চাহিদা কমল না। খাদ্যশস্যের জোগান কমল। খাদ্যের অভাব খাদ্য সংকট। শস্য কোম্পানির আজকে একটা শস্য দরকার, সেই শস্য চুক্তিতে চাষ করালো। কালকে বাজারে সেই শস্যের চাহিদা কমে যেতে পারে, বিকল্প শস্যে আসতে পারে। শস্য কোম্পানি সেই শস্যের চাষ বন্ধ করে দিতে পারে। চাষির মাথায় হাত। জমি, একটা শস্য চাষে তৈরি করে হঠাৎ করে আর একটা শস্য চাষে নিয়ে আসা যায় না। অন্য একটা বিপদ। নিজের পছন্দ মতো শস্য চাষ করতে গিয়ে কোম্পানি চাষিকে যে বীজ, যে উপকরণ দিল তা যে জমির পক্ষে, পরিবেশের পক্ষে, জলের পক্ষে, মাটির উর্বরতার পক্ষে, ভবিষ্যতে চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় তা চাষি জানবে কীভাবে? আরো একটা সমস্যা। একজন চাষি রাজি হল শস্য কোম্পানির কথা মতো চাষ করতে। শস্য কোম্পানির উপকরণ দিয়ে চাষ করলো। পাশের জমির চাষি রাজি হয়নি। রাজি হওয়া চাষির কোম্পানির দেওয়া উপকরণের ব্যবহার, পাছে রাজি না হওয়া চাষির জমি চাষ ক্ষতি করবে কিনা সে নিশ্চয়তা কে দেবে?

ঠিক এইখানেই বুঝে নিতে হবে খুচরো ব্যবসায়ে বড়ো কোম্পানির ঢুকে পড়া। ব্যবসায় বড়ো কোম্পানি বাজারের দুটো দিকই ধরে ফেলে চাহিদা আর জোগানের দিক। আমাদের কী খাওয়া উচিত ওরা বলে দেবে। সেই খাওয়া অনুযায়ী চাষিদের কী বানানো উচিত ওরা ঠিক করে দেবে।

এই ঠিক করা চাহিদা ও

ছবি : মানব পাল

জোগানে হারিয়ে যাবে সাধারণের খাদ্য শস্য, গরিবদের খাদ্য শস্য, গ্রামবাসীদের খাদ্য শস্য, চাষির নিজের খাদ্য শস্য, সেই শস্যের বীজ, সেই শস্যের চাষের উপকরণ, চাষির চাষ জ্ঞান। সেই শস্যে চাষের মাটি, মাটি উর্বরতা। ফলে গরিবদের খাদ্যশস্যের অভাব, খাদ্যাভাব, খাদ্য সংকট।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর যারা শাসন ক্ষমতায় বসেছিল তারা দায়িত্ব নিয়েছিল, তারা দায়িত্ব নিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করবে। দেশের সবাই যাতে দুবেলা পেট ভরে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। দেশের চাহিদা দেশের ভিতর থেকেই জোগান দেওয়া হবে। দেশের ভিতর খাদ্য তৈরি করতে, দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর হতে হলে যা যা করা দরকার করা হবে। দেশের খাদ্য শস্যের জন্য যে সার প্রয়োজন তা দেশের ভিতরই বানানো হবে। সারের কথাটা আলাদা করে উল্লেখ করা হল এই জন্য যে বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রথমেই সরকার সার বানানোতে বেসরকারি সংস্থাদের ঢুকতে দিয়েছিল। সেই শুরু আর এখন তো জমি, জল, বীজ, শস্য, চাষ সব কিছু বিদেশিদের জন্য হাট করে খুলে দেওয়া। এখন আর একথা বলা হচ্ছে না যে কৃষি বিদেশি হাতে ছেড়ে দিলে দেশের খাদ্য সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

আমরা দেশের 'খাদ্য সার্বভৌমত্ব' কথাটার ওপর জোর দিচ্ছি। 'খাদ্য সার্বভৌমত্ব' কথাটার মানে খাদ্যে স্বাধীন, স্বনির্ভর। আরো একটা মানে আছে একটা অঞ্চলের খাদ্যশস্যের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য, সেটা সেই অঞ্চলের 'খাদ্য সার্বভৌমত্ব'। এই কথাটার বদলে সরকারি শব্দ হল 'খাদ্য নিরাপত্তা'। মানে চাহিদা অনুযায়ী জোগান। সেই জোগানের দায়িত্ব নেবে সরকার। ভিতরের চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেওয়া হবে বাইরে থেকে, বিদেশ থেকেও। বাইরের ওপর নির্ভরশীলতা। এই কথাটার অন্য একটা দিক আছে - ঘরের চাষ সাজাও বাইরের চাহিদা অনুযায়ী, আর ঘরের চাহিদা সামলাও বাইরের জোগান দিয়ে। বাহির নির্ভরতা পরনির্ভরত। এই পরনির্ভরতার নানা চেহারা। রেশন দোকান, রেশন কার্ড, সরকারি মাপ অনুযায়ী খাবার পাওয়া, সরকারি দলের ইচ্ছে অনুযায়ী খাবার পাওয়া, সরকারের পাঠানোর ধরন অনুযায়ী খাবার পাওয়া, সরকারের ঠিক করা সময় অনুযায়ী খাবার পাওয়া। সরকারের অবহেলায়, সরকারি ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতায়, সরকারি দলের ক্ষমতার ব্যবহারে, প্রশাসনের অবজ্ঞায়, খাদ্য সার্বভৌমত্ব নীতির অস্বীকারে খাদ্য সংকট, খাদ্য অভাব, অনাহার, অপুষ্টি, মৃত্যু। এর সঙ্গে জুড়ে বুঝে নিতে হবে এখনকার সরকারের এখনকার নীতি, আইন, প্রকল্প, ব্যবস্থাপনা। খনি আইনে আদিবাসী অঞ্চলের মাটির নিচে খনি। উপকূল ধরে বানানো চলছে এটা ওটা সেটা। ভূমি অধিগ্রহণ আইনে ভূমিবাসীদের উচ্ছেদ, কারণ জমিতে এটা ওটা সেটা বানানো। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে বন থেকে বনবাসীদের উচ্ছেদ। বড় নদী প্রকল্পে নদীতিরবাসীদের উচ্ছেদ।

এইসব অঞ্চলের অধিবাসদের নিজস্ব খাদ্যশস্য সংগ্রহ, শস্য চাষ, বীজ, উপকরণ, লোকজ্ঞান, খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি,খাদ্য সঞ্চয় ব্যবস্থা, খাদ্য নির্মাণ প্রক্রিয়া, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যভিত্তিক শস্য ভিত্তিক সংস্কৃতি, খাদ্য ভিত্তিক, গবাদী পশুপালন, খাদ্য ও শস্য ভিত্তিক জীবন যাপন, খাদ্য ও শস্য শুধুমাত্র জমি ভিত্তিক নয় জল ভিত্তিক। শস্য শুধুমাত্র খাদ্য নয়, ঔষধি, গৃহস্থালি দ্রব্য, জীবন যাপন রসদ। কৃষি সমাজ। অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ মানে সামগ্রিক কৃষি সমাজ থেকে উচ্ছেদ। উচ্ছেদ প্রকল্প নেওয়ার সঙ্গে গালমন্দ করা। কৃষি পিছিয়ে থাকা বিষয়, কৃষকেরা 'অনুন্নত', আদিবাসীরা 'প্রাচীন আধুনিক', বনবাসীরা 'অসভ্য', জেলেরা 'অনগ্রসর', অতএব বাতিল, অতএব উচ্ছেদ, সুতরাং নাকচ, তাই 'অমান্য', অতএব ধ্বংস।

দেশের সংখ্যালঘু ক্ষমতাবান, ক্ষমতাসীনরা ঠিক করে দিচ্ছে সংখ্যাগুরুরা কেমন থাকবে, কীভাবে থাকবে, আদৌ থাকবে কিনা।

কৃষিতে ক্ষমতাসীনদের অহংকার তারাই সব ভালো জানে, সবার ভালো জানে, সঠিক ভালো জানে। তারাই নীতি, প্রকল্প, আইন, ব্যবস্থাপনা বানায়। বানিয়ে কৃষি সমাজের অধিবাসীদের বলে মানতে। মানতে বাধ্য করে। তারা সারা ভারত জানে, ভারতের কৃষি বোঝে, কৃষকের ভালো মন্দ বোঝে। এমন গর্ব তাদের। ক্ষমতার গর্ব, ক্ষমতাসীনদের গর্ব।

এবার সময় এসেছে এমন অবস্থাটা পাল্টে দেওয়ার। আর অপেক্ষা করার চুপ করে থাকার, মেনে নেওয়ার সময় নেই। এখন সত্যি সত্যি দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আর অপেক্ষা করলে কৃষি সমাজ, আদিবাসী, বনবাসী, সমুদ্র ও নদীতিরবাসী, ভূমিবাসী, চাষি, খেতমজুর, ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেকটা হয়েও গেছে, এবার আটকানোর পালা। ■■

ছবি : মানব পাল

বিকল্প চাষ: কেন ও কোন পথে

অর্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

কৃষি না শিল্প ? এ নিয়ে নানা মহলে তর্ক-বির্তক ইদানিং জমে উঠেছে। এই বির্তকে আলো খুব একটা বাড়েনি। বেড়েছে আওয়াজ আর ধোঁয়া। কিন্তু কৃষি নিজেই যে ক্রমশ শিল্পনির্ভর ও ভরতুকি নির্ভর হয়ে উঠছে এবং কৃষিজীবি বহু মানুষ যে আজ বিপন্ন, সেই সত্য আমরা বুঝতে পারিনি বা চাইনি।

চাষির হাতে কৃষির ভবিষ্যত নাকি অন্ধকার। আরো ভালো বীজ, আরো দামি যন্ত্রপাতি, আরো রাসায়নিক সার,নানা জীবননাশক, আরো বেশি গভীর নলকূপ ইত্যাদি না হলে নাকি কৃষি বাঁচবে না। কৃষিকে নাকি আরো বাজারমুখী করে তুলতে হবে। তার জন্য চাই দেশি ও বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির লগ্নী। চাষ-বাসকে শুধু একটা ব্যাবসা হিসেবে ভাবলে, এই নিষ্কর্ষে পৌঁছনই স্বাভাবিক। অর্থাৎ আমদানি নির্ভরতা আরো বাড়াতে হবে। ধনী ক্রেতার কথা মাথায় রেখে ফসল বাছাই করলে, শিল্পজাত রসায়ন ও খনিজ তেল নির্ভর চাষ ব্যবস্থার পেছনে ভরতুকির টাকা ঢাললে, প্রকৃত কৃষিজীবিদের প্রশিক্ষণের সুযোগ না দিতে পারলে, কৃষির উন্নতির নামে জৈব বৈচিত্র ধ্বংস করতে থাকলে, কৃষিভিত্তিক জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

কৃষি ব্যবস্থাকে কীসের নিরিখে মূল্যায়ন করা উচিত। প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ক্ষতি করছে, সে নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

ক্ষুধা আর অপুষ্টি দূর করা নাকি দেশের উন্নয়নের একটা প্রধান লক্ষ্য। উৎপাদন তিন চারগুণ বাড়লেও, ভান্ডারিত শস্যের বিরাট অংশ পচে নষ্ট হলেও অনাহার-অপুষ্টির দৌড়ে আমাদের দেশ ও রাজ্য এখনও অনেক পিছিয়ে। জন্মের সময় শিশুর ওজন, বয়স অনুযায়ী উচ্চতা এগুলিই অপুষ্টি মাপার স্বীকৃত মাপদন্ড। এই দুই বিচারে বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান অনেক নিচের দিকে। ভারতের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান পিছনের সারিতে। শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ শিশুই এখানে অপুষ্টির স্বীকার। অপুষ্টি দূর করাই যদি লক্ষ্য হত, তাহলে অন্তত শুকনো, খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে আমরা চিনা, সাওঁযা বা শ্যামা, বাজরা, জোয়ার মাড়ুয়া বা রাগী ইত্যাদিকে নির্বাসনে পাঠাতাম না। তার জায়গায় শুধু ধান বা গম বা আলু চাষকে উৎসাহ দেওয়া আমাদের নীতি হত না। সেদ্ধ চাল যদি ঢেঁকিছাটা হয় তাহলে তাতে পুষ্টি থাকে অনেক বেশি। কিন্তু রেশন দোকানে জোগান দেওয়ার জন্য, লেভি আদায়ের সুবিধার্থে এবং বড় ব্যবসায়ীকে বাজারে ঢোকার সুযোগ করে দিতে ছোট ও মাঝারি ধানকলগুলিকে বেআইনি করা হয়। আর জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করা হয় যে পালিশ করা ফর্সা চালই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। লাল চাল খায় শুধু গরিব লোকেরা ! গত চার দশকে এই প্রচারের ফলে অপুষ্টি অনেক বেড়েছে বলে আমি মনে করি। এখন ডাক্তারবাবুদের কথা শুনে শহরের কিছু উচ্চবিত্ত লোক ‘কমপ্লিট রাইস’ - সাদা বাংলায় ঢেঁকিছাটা চাল এবং ছোট দানা শস্য বা ‘মিলেট’ খেতে শুরু করেছেন। কিন্তু এসব ফসলের চাষ প্রায় উঠে গেছে। সেরকমই থানকুনি, ব্রাহ্মী, বেথোশাক, কাঁটা নটে, হেলেঞ্চা শাক ইত্যাদিও হয় খুব গরিব লোক খায়, কিম্বা আমরা অসুস্থ হয়ে পড়লে কিনে খাই। টোপাকুল, দেশি পেয়ারা, কামরাঙা, ফলসা জাম ইত্যাদি ফলেও পুষ্টি অনেক বেশি। কিন্তু হয় প্রচারের অভাবে নয় ফড়েরা কিনতে চায় না বলে (কারণ এসব ফল কাঁচা পেড়ে পরে গ্যাস দিয়ে পাকানো কঠিন) এসব ফলের চাষ উঠে যেতে বসেছে।

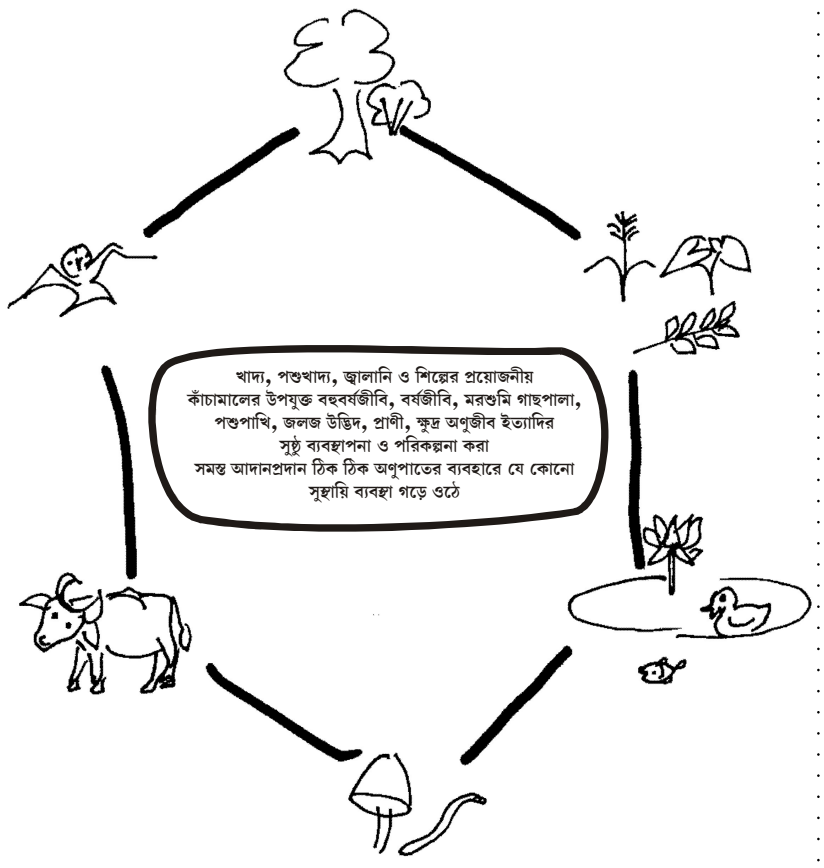

সবাইকে পাঠাশালায় নিয়ে আসতে হবে। এটাও উন্নয়নের একটা লক্ষ্য। পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়াকে একটা বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু একটা কৃষি প্রধান দেশে শিক্ষা কেন এত বেশি শহুরে চাকরি কেন্দ্রিক ? আমরা কি শিশুদের নিজের গ্রামের ভূগোল, নিজের চারপাশের গাছগাছালি, পশুপাখি, মাছ ইত্যাদির কথা আরো বেশি শেখাতে পারি না। আর কেনই বা বেশিরভাগ পরীক্ষা, চাষের কাজে চাপ যে সময়ে বেশি তখনই হয়। এতে তারা বাবা-মাকে চাষের কাজে কোনো সাহায্য করতে পারে না। আর তাদের হাতে কলমে চাষের কাজ শেখাও বন্ধ হয়ে যায়।

চাষের কাজকে ছোট করে দেখার কাজে শিক্ষিত লোকেরাও পিছিয়ে নেই। সর্বহারা দলের নেতাও ‘চাষা’ বলতে সঙ্কোচ বোধ করে না। এদেশে যারা চাষবাস নিয়ে পড়ে তারা কেউ চাষি হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। আর যারা চাষ করে, তাদের বা তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার সুযোগ অধরাই থেকে যায়। চাষিদের প্রতিনিধি হিসেবে যারা সভা-সমিতি বা যোজনা কমিশনের আসন আলোকিত করে তাদের বেশিরভাগই জমির মালিক বা কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী। তাই যাদের নিয়ে আমাদের এত চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা তৈরির সময়ে সেই খেটে খাওয়া ছোট বা প্রান্তিক চাষিরাই সাধারণত ব্রাত্য থেকে যায়।

চাষ-বাসের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গ্রামের উন্নতি সম্ভব। বহুজাতিক কোম্পানির লগ্নী ছাড়াও মূলধনী সম্পদ বাড়ানোর অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক জলবিভাজিকার পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করে কীভাবে কাজের দিন বাড়ানো যায় তা দেখিয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বর্ষার জলনির্ভর কৃষিকাজ ও পশুপালন, বনায়ন সংক্রান্ত কাজ হয়েছে এখানে। সরকারি টাকা ব্যবহার করেই এই কাজ হয়েছে।

কৃষির ভিত্তি পরিবেশ, আবার কৃষি পরিবেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সঙ্কর জাতে কয়েকটা ফসল, যেগুলি বেশি বেশি কৃত্রিম সার ও বিষ ছাড়া বাঁচতে পারে না। কিছু পশুপাখি আছে যারা দানাশস্য, মাছ বা হাড়ের গুঁড়ো, ‘অ্যান্টিবায়োটিক’ ছাড়া বাঁচতে পারে না। প্রথম প্রথম এগুলি উৎপাদন কিছু বাড়ায়। কিন্তু সেই বৃদ্ধি ধরে রাখতে পারে না। ফলে আরো বেশি করে কৃত্রিম বস্তু ব্যবহার করতে হয়। যা চাষকে করে তোলে ভরতুকি নির্ভর। মাটি ও জলকে দূষিত করে জৈব বৈচিত্র অনেক কমিয়ে দেয়। বহু জীবজন্তু, উপকারী পোকা মাকড়, অণুজীবকে বিপন্ন বা ধ্বংস করে। এতে অতিরিক্ত মাটির তলার জল ব্যবহার হয়। ক্রমশ তা শেষও হত থাকে। ফলে উর্বর মাটি প্রাণহীন প তিত জমিতে রূপান্তরিত হয়। মৌমাছি, ব্যাঙ, কেঁচো, বহু পোকামাকড়ের শিকারী মাছ, পাখি আজ হয় বিপন্ন, নয় অবলুপ্ত। আমাদের খাবার আজ প্রধানত তিরিশ পঁয়ত্রিশটি শস্য ও সবজির ওপর নির্ভরশীল। অথচ তিন হাজারেরও বেশি গাছ-গাছালির উপযোগিতা

সাধারণ মানুষের জানা আছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জমির লবণাক্ততাসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলায় এগুলি আমাদের হাতিয়ার হতে পারতো। ভরতুকি ও দূষণের জাঁতাকলে আমাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সবই আজ বিপন্ন। এখনো কি আমাদের ঘুম ভাঙবে ?

কোন পথে সুস্থায়ী চাষ, কীভাবে আমরা নতুন চাষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি ? কৃত্রিমভাবে তৈরি সার আর কীটনাশক, আগাছা নাশকের ব্যবহার বন্ধ করে দিলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন কি খুব কমে যাবে না ? অনেকেই এসব প্রশ্ন করেন। সজীব বা সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা কিন্তু শুধুই জিন প্রযুক্তির বীজ, রাসায়নিক সার ও জীবনাশক, ভূজলের পাম্প আর বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার বন্ধ করলে আপনিই আসবে না। চাষকে সুস্থায়ী করার জন্য ছয়-সাতটি শর্ত পূরণ করতে হবে। এখানে সংক্ষেপে তারই কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি। আমাদের রাজ্যের কিছু জায়গায় চাষি বাগানির দলেরা এই নীতি অনুযায়ী কাজ করে ভালো ফল পেয়েছেন। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরাসরি সেখানে গিয়ে, নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শুনে সন্দেহ নিরসন করতে পারে।

প্রথম শর্ত বৈচিত্র বাড়াতে হবে। জাত ও প্রজাতির বৈচিত্র, আকার আকৃতির বৈচিত্র, ফসল ব্যবস্থা ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র। এগুলি বাড়িয়ে, যত উচ্চতা অবধি এবং যত সময় পর্যন্ত আমরা চাষজমি ব্যবহার করতে পারবো, ততবেশি আমাদের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়বে। উদাহরণ হল ধান-গম-ভুট্টা প্রভৃতির সঙ্গে বা পরে শুঁটিজাতের শস্য, যেমন ডাল, চিনাবাদাম, ইত্যাদি চাষ করে মাটিকে উর্বর রাখা সম্ভব। যে ফসল বা সবজি নানাভাবে ব্যবহার করা যায় এবং যেগুলি নানা প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে তাদের চাষে মনোযোগ দিলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

মরশুমি শস্য ও সবজির সাথে দীর্ঘস্থায়ী গাছ-গাছালি এবং পশুপাখি, মাছ ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। সমন্বয়ের মাধ্যমে একের বর্জ্য অন্যের পুষ্টির কাজে ব্যবহার করা যায়। শক্তির সাশ্রয় হয়। পরিশ্রম ও অনেক কমানো যায়। খেতের গড়ন একটু পালটে সমন্বিত চাষ করা যায়। একাজে উপযুক্ত জাত ও প্রজাতির সঠিক সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার। চাষের বিভিন্ন বর্জ্যকে আমরা যত বেশিবার ব্যবহার করতে পারবো চাষে তত বেশি লাভ হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোবর পচিয়ে তা খেতে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই গোবর থেকে আমরা গ্যাসও উৎপাদন করতে পারি, যা দিয়ে রান্না করা যায়। পাম্পসেট চালানো যায়। এই গোবরগ্যাস প্লান্ট থেকে যে তরল গোবর বা স্লারি বের হয় তাকে মাছের খাদ্য হিসেবে, কেঁচোর খাদ্য হিসেবে, মাশরুম চাষে, অ্যাজোলা, গুঁড়িপানা চাষের জন্য বা জলের সাথে মিশিয়ে তরল সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বাইরে থেকে যা কিছু আমরা কিনি তার ওপর নির্ভরতা কমানো। এগুলির বিকল্প তৈরি, ফসলের জাত ও প্রজাতি বাছাই, জমির গড়ন পরিবর্তনর এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বেশ সমৃদ্ধ। এই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কাঠামো ব্যবহার করতে হবে, যাতে স্থানীয় অভাবী মানুষজনের চাহিদাগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায়।

মাটিকে প্রাণবন্ত রাখা, মাটির অণুজীবদের বাঁচিয়ে রাখা ও বাড়িয়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার তৃতীয় শর্ত। মাটিকে আলগা রাখা, মাটির ভিতর জৈব উপাদান বাড়িয়ে তোলা, গাছগাছালি বা ফসলের বর্জ্য দিয়ে মাটির ওপরে আচ্ছাদন -এগুলিই হল মাটি জীবন্ত করে তোলার প্রধান পদক্ষেপ।

মাটির মধ্যে এবং উপরে বৃষ্টির জল ধরে রাখাও একটি জরুরি শর্ত। জল ধরে রাখার জন্য আল তৈরি, জীবন্ত বাঁধ হিসেবে ঝাঁকড়া শিকড় যুক্ত ঘাস ও ঝোপের বা গাছের লাইন তৈরি করাও খুব জরুরি। জমিতে জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কম্পোস্ট, কাঠকয়লা, পুকুরের পাঁক মাটি, নিয়মিত চাষের জমিতে মেশানো দরকার। সবুজ সার কেঁচোসার ব্যবহার করেও মাটিকে উর্বর করে তোলা যায়। কিন্তু প্রধান ও প্রথম ধাপ হল, রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করা।

বাতাসের বেগ, জলের বেগ, সৌর শক্তির মত অফুরন্ত শক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং খনিজ তেল ও তার থেকে তৈরি বিদ্যুৎ, রসায়ন ইত্যাদির ব্যবহার কমানো বা একেবারে বন্ধ করা সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার জরুরি শর্ত। সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় নানা জৈব শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। পশুশক্তি ব্যবহার করে মাটিকে কর্ষণ করা, হাঁস-মুরগি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ, মৌমাছির চাষ করে পরাগ সংযোগ বাড়ানো, পাখি বা মাছ দিয়ে পোকামাকড়ের শিকার, চাষের কাজে দ্রুত বেড় ওঠে এরকম গাছ ঝোপের ব্যবহার হল জৈব শক্তি ব্যবহারের উদাহরণ। অণুজীব ঘটিত নানা সার, কেঁচো সার, ভেষজ কীটরোধকের বেশি করে ব্যবহারও সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার জরুরি অঙ্গ। কাঠ কয়লাও মাটির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলে। ধানের তুষ ও চিটে বন্ধ চুল্লীতে পুড়িয়ে তাপ বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব এবং এই কারখানার বর্জ্যও মাটিতে মেশালে মাটি ভালো হয়। এই ধরনের বিদ্যুৎ চুল্লী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি গ্রামীণ জীবনকে উন্নত করার কাজে জরুরি ভূমিকা পালন করতে পারে।

স্থানীয় গাছ ও ফসলের বীজ ভাণ্ডার তৈরি করাও সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটি প্রধান শর্ত। চলতি চাষ ব্যবস্থায় বহু ফসলের জাতি-উপজাতি-প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার মুখে। তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে এই ফসলগুলি চাষ ও তার ব্যবহার করার জ্ঞান। এখন স্থানীয় গাছ-গাছালি ও পশুপাখির ওপর ভিত্তি করে নতুন করে সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে বৈচিত্রময় উদ্ভিদ বীজ, প্রজাতিকে ধরে রাখা যায়। এক্ষেত্রে জরুরি কাজ হল স্থানীয় ফসল, সবজি ইত্যাদি লাগানোর এবং তোলার ক্যালেন্ডারের তৈরি এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গাছগাছালির সম্পর্কে যে স্থানীয় জ্ঞান রয়েছে তার তথ্যায়ন।

সমস্যা হিসেবে যেগুলিকে দেখা হয়, যেমন উইপোকা কচুরিপানা, গুঁড়িপানা ও অন্য ডাঙা ও জলের আগাছা ইত্যাদিকেও সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা একটা জরুরি শর্ত। কোন আগাছা খাওয়া যায়, কোনগুলি মাটি ধরে রাখতে ও উর্বর করে তুলতে পারে, কোনগুলি দিয়ে সাধারণ রোগবালাই সারানো যায় এইসব জ্ঞানের ভিত্তিতেই সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

বিবিধতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে সার, তেল বড় বড় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াও যে উৎপাদন করা যায় এবং লাভজনক ব্যবসা করা সম্ভব। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কিউবা তার উদাহরণ। আমেরিকার ব্যবসায়িক বয়কট ও সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট, তাদের গতানুগতিক চাষ ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছিল। আমরা যদি সত্যি অর্থে সাবলম্বী হত চাই। সবার জন্য শিক্ষা, সবার হাতে কাজ-এর স্লোগানে বিশ্বাস করে, পুষ্টি ক্ষুধাকে চিরতরে নির্বাসনে দেওয়ার স্বপকে রূপায়িত করতে চাই। তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা, ছোট ও প্রান্তিক চাষিকে একজোট করা ও বিপন্ন পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্রকে রক্ষা করার কাজে দৃঢ় সংকল্প ও পরিষ্কার ধ্যান ধারণা গড়ে তুলতেই হবে। ■■

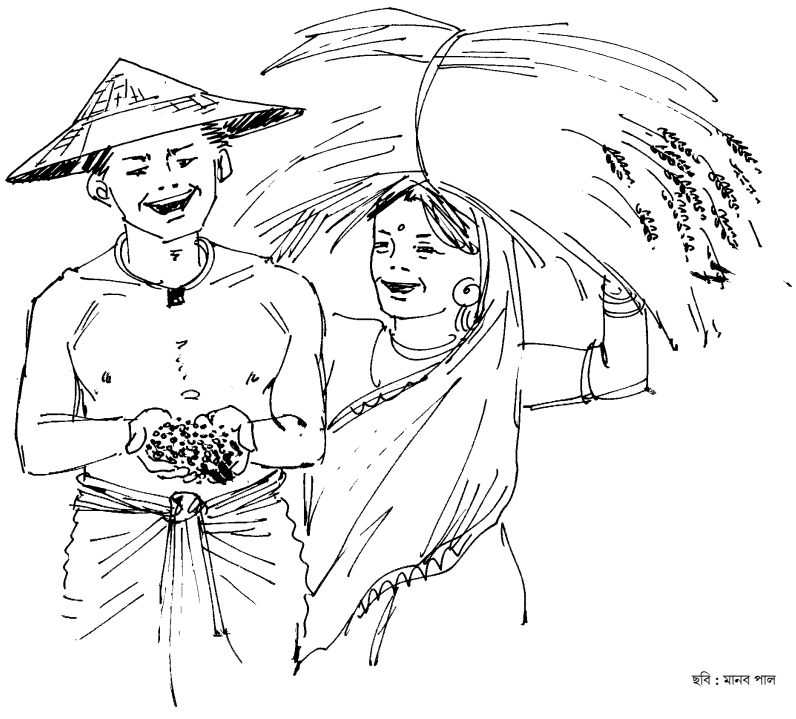

ছবি : মানব পাল

কেমন গ্রামোন্নয়ন ?

সুব্রত কুন্ডু

আমাদের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে মত-বিনিময় ও মূল্যায়নের ধারাবাহিক কার্যক্রম দরকার, যাতে এর আরো উন্নতি করা যায়, এর জন্য একটি স্বাধীন মূল্যায়ন সংস্থা গঠন করা জরুরি। ইন্ডিয়া রুরাল ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১২-১৩ আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সময় একথা বলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। রিপোর্টটি তৈরি করেছে আইডিএফসি ফাউন্ডেশন সহ আরো কিছু নামজাদা সামাজিক ও গবেষণা সংস্থা। প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোজনা কমিশনের সদস্য ড. মিহির শাহ বলেন, জল হল জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস। সেই কারণে জলের বিভিন্ন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে করতে হবে। একাজে 'জন-সমূহ' এবং সরকারের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন।

রিপোর্টটিতে খুব সঙ্গতভাবেই কৃষি-জীবিকা প্রসঙ্গে একটি বড় অংশ লেখা হয়েছে যা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় :

- কৃষি থেকে আয় আর পরিবারগুলির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রে। এই চাষিরা মোট জমির ৮৫ শতাংশের মালিক। এর মধ্যে আবার শুখা এলাকার চাষিরা অর্ধেকের বেশি জমির মালিক।
- এদের জন্য নতুন চাষের মডেল দরকার। এছাড়া শুখা এলাকা বিভিন্ন ধরনের ছোট দানাশস্য (মিলেট) চাষ ফের শুরু করা দরকার। কারণ এই ধরনের শস্য স্থানীয় এলাকার উপযুক্ত, শক্ত-সমর্থ, পুষ্টিকর। এইসব শস্য গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা দরকার।
- বিভিন্ন ধরনের সামূহিক বা যৌথ চাষ -ব্যবস্থা চালু করা যাতে ঋণ, ভরতুকি, জমির মালিকানা, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছোট ও প্রান্তিক চাষির নানাদিক থেকে সহায়তা হতে পারে।
- অন্ধ্রপ্রদেশের ২০ লক্ষ চাষি সাফল্যের সঙ্গে সামূহিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ীভাবে কৃষি কাজ করছে। এতে তাদের খরচ বহুল পরিমাণে কমেছে। কারণ ফসল তৈরি ও তা বাঁচানোর জন্য তাদের রাসায়নিক সার, বিষ ব্যবহার করতে হচ্ছে না। এ ধরনের চাষের প্রসার আরো ব্যাপকভাবে করতে হবে।
- চাষের জন্য মোট মিষ্টি জলের ৮০ শতাংশের ব্যবহার হয়। জল কে আরো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। জল তার উৎসকে (ভূ-জল ও ভূপৃষ্ঠ জল উভয়কেই) সামাজিক সম্পদ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এসবই খুব ভালো ভালো কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি। কেন্দ্রীয় সরকার হই হই করে পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সবুজ বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হল হাইব্রিড বীজ। যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর জল, রাসায়নিক সার, বিষ। এতে পরিবেশ, স্বাস্থ্য দূষিত হবে একথা এখন সবাই জানে। কিন্তু অন্য যে বিপদ এর সঙ্গে আসছে তা হল প্রচুর খরচ। এই খরচ সামলানোর জন্য ঋণ। ঋণের জন্য কৃষকের আত্মহত্যা। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ঘটনা। ছোট চাষি ঋণের দায়ে ক্রমশ প্রান্তিক চাষিতে পরিণত হচ্ছে। প্রান্তিক চাষি পরিণত হচ্ছে ভূমিহীনে। নিন্দুকেরা বলছে সবুজ বিপ্লব শুধু হাইব্রিড বীজে থেমে থাকবে না। জিন পরিবর্তিত ফসলও এর সঙ্গে ফেউ হিসেবে আসছে। কেউ কেউ বলছেন এ হল কৃষি-সংস্কৃতি থেকে কৃষি-শিল্পে 'উত্তরণ'-এর এক ভয়ংকর নীল-নকশা। না হলে সরকার সবুজ বিপ্লবের ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে,কী করে বছরের পর বছর একাজে অর্থ বরাদ্দ করছে।

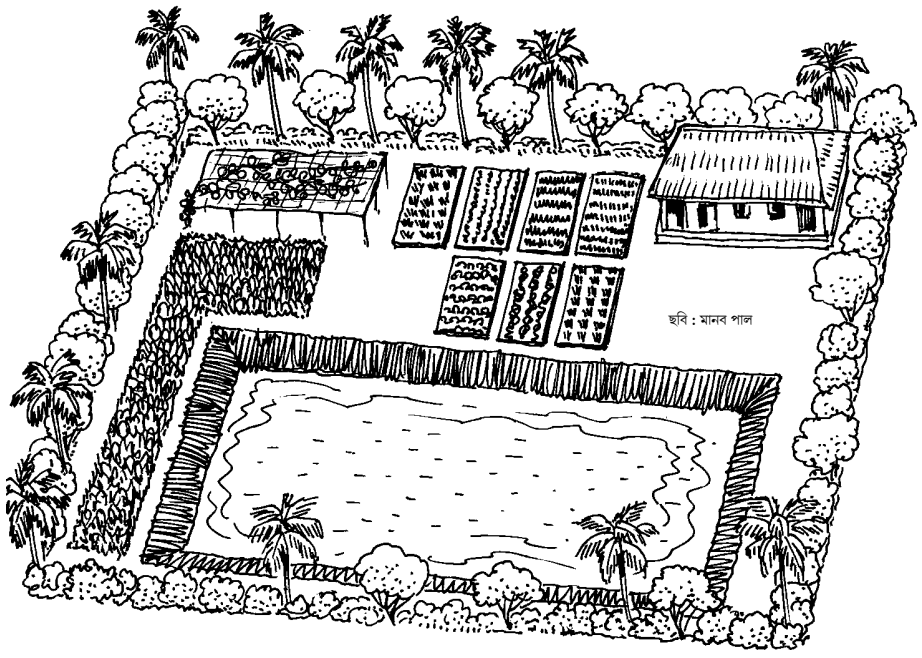

গ্রামোন্নয়ন রিপোর্টে একদিকে যেমন মানুষের অংশগ্রহণ, প্রাকৃতিক সম্পদ কে সামূহিক সম্পদ বলা হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষি রাজ্য তালিকায় থাকলেও তা কেন্দ্রীয় সরকার বীজ, জিন ফসল, জৈবপ্রযুক্তি, জল ও জমি আইনের মাধ্যমে কুক্ষিগত করতে চাইছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। সরকারে মুখ আর মুখোশ নিয়ে তাই ধন্দ থেকেই যাচ্ছে। ■■

ন তু ন ব ই

খাওয়ার আইন। সবাই খাওয়ার আইন-খাদ্য সুরক্ষা আইন। তবে আইন করে সবাই খাবার পাবে কি পাবে না তা নিয়ে দোলাচল বার্তাজীবী -সমাজব্রতী -অর্থশাস্ত্রী সমাজে। এই বইতে এমনই যুক্তিবাণে ১০ চিন্তক ১০ নিবন্ধে, একেবারে জঁ দ্রেজ থেকে দেবিন্দর শর্মা। তৎসহ আইনের কথাসার।

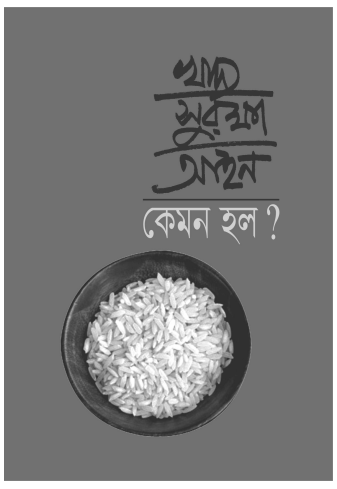

ডি আর সি এস সি

২৪৭৩৪৩৬৪ || ২৪৪২৭৩১১ || ৯৪৩৩৫১১১৩৪ || drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com

কৃষিতে অর্থের জোগান ও নাবার্ড

নাবার্ডের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল

- কৃষক ও ভাগচাষি এবং জনমজুরদের সুস্থায়ী জীবিকার সংস্থান।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- কৃষকদের ঋণ, প্রযুক্তি, বিপণন ও বাজার সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠান গঠন।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শৌচাগার, পানীয় জলের মতো মূলগত সামাজিক পরিকাঠামোর অভাব মেটাতে সচেষ্ট হওয়া।
- প্রান্তিক মানুষজনের সামাজিক নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বহনের ব্যবস্থা করা।

এই উদ্দেশ্য পূরণে নাবার্ড পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় ও সেগুলি সফলও হয় ।

ওয়াডি প্রয়াস

আদিবাসী গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ী জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে ফলের বাগান করতে সহায়তা করা হয়। এমন প্রতিটি প্রকল্পের অধীনে ১০০০ করে আদিবাসী পরিবারকে, পরিবার পিছু ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় । প্রথম ৩ বছর ফলের বীজ রোপণ করে চাষ করা হয় এবং পরবর্তী ৫ বছর গাছগুলির পরিচর্যা করা হয় । এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৭০ হাজার আদিবাসী পরিবার উপকৃত হয়েছেন ।

জল বিভাজিকা প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থিত ব্যবস্থা

সুস্থিত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯২ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র জল বিভাজিকা উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এরকম ১৯১৫ টি প্রকল্পে ৩০৩০টি গ্রামের ৩২ লক্ষ কৃষককে সহায়তা হয়েছে। স্বেচ্ছা শ্রমদান, স্বনির্ভরতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে এই কাজ চলছে । প্রতিটি গ্রামে কাজ তদারকির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শ্রী পদ্ধতিতে ধানচাষ

মাদাগাস্কারে ২৭ বছর আগে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। বর্তমানে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে নাবার্ড ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় কৃষকরা এই কর্মসূচি পালন করছেন। অন্যান্য এলাকাতেও এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের জন্য নাবার্ড প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগের খরচ বহন করছে। এই পদ্ধতিতে বীজের খরচ ৬০ শতাংশ জলসেচের খরচ ৪০% ও সারের খরচ ৩০ শতাংশ খরচ কমে । পাশাপাশি ফলন বাড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা এই পদ্ধতিতে চাষ করে অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছেন। কম জলে চাষের এই পদ্ধতি বার্লি, গম ও আখ চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেও আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে।

বীজ গ্রামের ধারণা

সাধারণত স্থানীয়ভাবে বীজের সংরক্ষণ পদ্ধতি খুব একটা ভাল হয় না । ফলে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা মার খায়। এই সমস্যা দূর করতে এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার ৯০ শতাংশ করতে নাবার্ড বীজ গ্রাম প্রকল্পে সহায়তা করে । এই প্রকল্পের ফলে স্থানীয় স্তরে বীজের উৎপাদন, সরবরাহ এবং গুণমান কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে । বীজ উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যয় কমে এবং বীজ প্রতিস্থাপন ও দ্রুত এবং সুবিধাজনকভাবে করা যায়।

কৃষকদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

লিড ব্যাঙ্ক প্রকল্প ১৯৬৯

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলার জন্য নাবার্ড, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতিতে জেলার লিড ব্যাঙ্ক চিহ্নিত করে । এই ব্যাঙ্ক ওই জেলার সমস্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে চাষি, ফার্মার্স ক্লাব ও সরকারের বিভিন্ন দফতরের সেতু হিসেবে কাজ করে । লিড ব্যাঙ্ক, লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ও অফিসার নিয়োগ করেন, যাদের মাধ্যমে চাষের ওই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ঋণের অনুমতি পত্র মেলে । অর্থাৎ নাবার্ডের মাধ্যমে কোনো ঋণ নিতে গেলে লিড ব্যাঙ্কেরও অনুমতি প্রয়োজন। এছাড়া লিড ব্যাঙ্ক প্রকল্পের মাধ্যমে চাষি, দল সহজেই সরকারি অন্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে । নাবার্ড-এর মাধ্যমে চাষিদলের ক্লাব গঠনের জন্য লিড ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি ।

কৃষকদের ক্লাব ও যৌথ দায় গোষ্ঠী

বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় নাবার্ড কৃষকদের ক্লাব প্রকল্পটি চালু করেছে । এই ক্লাবগুলি প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঋণ সংক্রান্ত পরামর্শ, বাজার বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ, কৃষিজমি পরিদর্শন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির যোগাযোগ, ঋণ পরিশোধ সাহায্য, ঋণ পাওয়ার জন্য যৌথ দায় গোষ্ঠী গঠন, প্রভৃতি কাজ করতে পারে। কয়েকটি কৃষক ক্লাবকে নিয়ে গঠিত হয় কৃষক সংঘ, যারা ফসলের মান নির্ণয়, ব্যয় নির্ধারণ, প্যাকেজিং এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখে। এর ফলে ফড়েদের হাত থেকে চাষিরা বাঁচে। এই প্রকল্পে নাবার্ড বছরে ১০ হাজার টাকা কৃষক ক্লাবকে অনুদান দেন । কৃষক ক্লাব খোলার জন্য জেলার নাবার্ডের ডিডিএমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

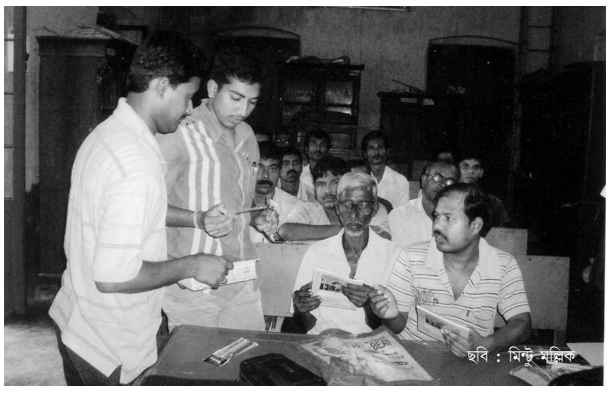

ছবি : মিন্টু মালিক

প্রযুক্তির প্রয়োগ

আধুনিক প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও শিল্প ও বাজার সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সময়মতো পাওয়া যায়। এর ফলে নাবার্ডের সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নোক্ত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চাষিদেরকে বাজারদর সংক্রান্ত সঠিক তথ্য দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

প্রযুক্তিগত প্রয়োগের কয়েকটি সফল দৃষ্টান্ত হল

ই-সাহু : (হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ)- তুলো চাষের ক্ষেত্রে ফসলের রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত অনুসন্ধান।

ই-কুটির : (নয়াগড়, ওড়িশা) - বাজার ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের জোগান ও পরামর্শদান

ই-চৌপল : (মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় প্রভৃতি) - বাজারের দাম ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ।

রয়টার্স লাইট : (মহারাষ্ট্র) - আবহাওয়া ও বাজার সংক্রান্ত তথ্যের জোগান।

উৎপাদক কোম্পানি

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. টি. কে. আলম এর সুপারিশ অনুযায়ী ২০০২ সালে এই ধারণার জন্ম । এজন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে ix a নামে নতুন একটি অংশও সংযোজিত হয় । এর মাধ্যমে সমবায় সংস্থাগুলিকে কোম্পানি হিসেবে নথিবদ্ধ করা যেতে পারে । বর্তমান সমবায় সংস্থাগুলিকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করাও এর মাধ্যমে সম্ভব । এর ফলে আইনগত কাঠামোর মধ্যেই সমবায়গুলি উৎপাদক কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি পায় । ■■

তথ্য সূত্র : ww.rbi.org.in.Publications

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত রানা কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.in@gmail.com, www.drcsc.org